• মানবাধিকার [Human Rights] :

ভূমিকা : আজকের দিনে যে বিষয়টি নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা চলছে সেটি হল 'মানবাধিকার' (Human Rights)। এর সূত্রপাত যেদিন থেকে (১৯৪৫) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা **'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস্'** নামে মানবাধিকারের সনদটি গ্রহণ করেছে। বিশ্বব্যাপী ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় জাতিপুঞ্জে যে সনদটি গৃহীত হয়েছিল তা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের অধিকারের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক চেতনার প্রসার ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রকে নিয়েই মাথা ঘামায় না, যেসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়ে রাষ্ট্র, সেইসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভালমন্দের ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

• মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি [Definition and Nature of Human Rights] :

সাধারণভাবে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মানবজাতির সদস্য হিসাবে মানুষ কতকগুলি স্বাভাবিক ও শাশ্বত অধিকার ভোগ করে থাকে এবং এগুলিকে বলা হয় মানবাধিকার। এগুলি ছাড়া মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। অর্থাৎ মানবাধিকার হল সেইসব শাশ্বত ও স্বাভাবিক অধিকার যেগুলি ছাড়া মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না এবং তার সত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে না। **'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কেন্দ্র'** (United Nations' Centre for Human Rights)-এর মতে, মানবাধিকার হল সেইসব অধিকার যেগুলি মানুষের সহজাত (inherent) এবং যেগুলি ছাড়া মানুষ হিসাবে আমরা বাঁচতে পারি না। প্রখ্যাত সংবিধান বিশারদ **দুর্গাদাস বসু**-র মতে, মানবাধিকার হল সেইসব ন্যূনতম অধিকার যেগুলি মনুষ্য পরিবারের সদস্য হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্র বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভোগ করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি **নগেন্দ্র সিং**-এর মতে, পৃথিবীর যে-কোনো অংশে বসবাসকারী প্রতিটি পুরুষ অথবা নারী একজন মানুষ হিসাবে যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেগুলিকে মানবাধিকার বলা হয়।

জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার, ভোটদান ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার, সভা-সমিতি গঠনের অধিকার, বসবাসের অধিকার, রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পৌর, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' (The Protection of human Rights Act)-এর ২ (১) ঘ ধারায় বলা হয়েছে, **"মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদাসংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি (ভারতীয়) সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য"** ("Human Rights mean the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts of India.")। অনেক সময় মানবাধিকার বলতে রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের অধিকারকে বোঝানো হয়।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুধরনের ভূমিকা

মানবাধিকারের দুটি দিক আছে : একটি নেতিবাচক এবং অপরটি ইতিবাচক। **নেতিবাচক** দিক থেকে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্র কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। আর **ইতিবাচক** দিক থেকে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলির বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। **নেতিবাচক অধিকারগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব তখনই যখন রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে গৌণ।** এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারাটি হবে ক্ষুদ্রতম, যাকে নজিক (Robert Nozick) বলেছেন "Ultra minimalist state."। **অপরদিকে ইতিবাচক অধিকারগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারাটি হবে অতিকায়।** এই দুই ধরনের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্র একদিকে যেমন নিপীড়নের যন্ত্র হতে পারে, অন্যদিকে সেটি আবার জনকল্যাণকর সংগঠন হয়ে উঠতে পারে।

১৯৪৮ সালে গৃহীত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'বিশ্ব ঘোষণাপত্রে, মানবাধিকারকে বিশ্বজনীন অধিকার' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের যে-কোনো প্রদেশে বসবাসকারী যে-কোনো স্তরের মানুষ এই অধিকার ভোগের উপযুক্ত। মানবাধিকারের ধারণা কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এই অধিকার হল মানবজাতির অস্তিত্ব ও স্বার্থ সুরক্ষার প্রয়োজনে বিশ্বপর্যায়ে তথা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা।

মানবাধিকার অ-হস্তান্তরযোগ্য। এইসব অধিকারকে কেউ অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে না। আবার বা কেউ এইসব অধিকারকে ধ্বংস করতে বা কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার সহজাত। মানুষ জন্মসূত্রে এইসব অধিকার লাভ করে। **পল সিগহার্ট** (Paul

Sieghart) বলেছেন, মানবাধিকার অর্জন করতে হয় না, মানুষ জন্মসূত্রে এইসব অধিকার লাভ করে; কোনো আইন বা ঘটনা এগুলিকে হস্তান্তর, বিক্রয় বা ধ্বংস করতে পারে না।

● মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণাটির বিবর্তন ও সম্প্রসারণ [Evolution and Expansion of the concept of Human Rights] :

মানবাধিকারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। প্রাচীন গ্রিসের স্টৈহিক দর্শনে এবং রোমের আইনব্যবস্থায় মানবাধিকারের বীজ নিহিত থাকতে দেখা যায়। তার বেশ কিছুকাল পর ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে মহাসনদ (Magna Carta) গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সংকুচিত হতে থাকে এবং মানবাধিকারের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর ইউরোপের নবজাগরণ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদনপত্র (Petition of Rights), গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮), ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) মানবাধিকারের ধারণাটিকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নাৎসি জার্মানির মানবাধিকার লঙ্ঘনের বীভৎস কার্যকলাপ বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিকামী মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সচেষ্ট করে তোলে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত হল বিখ্যাত মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি (Universal Declaration of Human Rights), যা মানবাধিকারের যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন।

জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে যেসব অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলিকে দুটি অঙ্গীকারপত্রে (covenants) ভাগ করা হয়েছে—(১) পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্র (The International Covenant on Civil and Political Rights) এবং (২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকারপত্র (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right)। এই দুটি অঙ্গীকারপত্র সাধারণ সভা কর্তৃক ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গৃহীত হয়। ঘোষণাপত্রের ১নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকার ও মর্যাদার বিচারে সকলেই সমান। স্পষ্টতই এটি স্বাভাবিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

(১) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত অধিকারসমূহ : ঘোষণাপত্রের ২ থেকে ২১নং ধারাগুলিতে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত অধিকারসমূহের উল্লেখ আছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, আইনের সামনে সমানভাবে বিবেচিত হওয়ার ও আইন কর্তৃক সমভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার; যাতায়াতের অধিকার; বসবাসের অধিকার; শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার এবং সংস্থা গঠনের অধিকার; প্রত্যক্ষভাবে অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ পরোক্ষভাবে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার; নিজ নিজ দেশের সরকারি কৃত্যকে যোগদানের ক্ষেত্রে সমানাধিকার; যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অব্যাহতির অধিকার; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার; চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর বিবাহ করার, পরিবার গঠনের

এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই পরিবারের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; প্রত্যেকের নাগরিকত্ব লাভ ও বদলের অধিকার এবং যথেচ্ছভাবে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকারপত্র : ঘোষণাপত্রের ২২ থেকে ২৭নং ধারাগুলিতে যে সমস্ত অধিকার স্থান পেয়েছে, সেগুলি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কর্মের অধিকার; কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার অধিকার; বেকারত্বের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজে সমান বেতন পাওয়ার অধিকার; নিজের স্বার্থরক্ষার্থে প্রত্যেকের শ্রমিক সংঘ (Trade Union) গঠনের ও তার সদস্য হওয়ার অধিকার; বিশ্রাম ও অবকাশ যাপনের অধিকার এবং নির্দিষ্ট সময়-অন্তর সবেতন ছুটি পাওয়ার অধিকার; সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার; শিক্ষার বিশেষ করে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার; নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার; বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বার্ধক্য, বৈধব্য ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থায় উপযুক্ত নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার, প্রসূতি ও শিশুদের উপযুক্ত যত্ন ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার; নিজের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার; বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের এবং তার সুফলের ভাগ নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

১৯৪৮ সালে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় যেসব অধিকার উল্লিখিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। **ক্রিস ব্রাউন (Chris Brown), ড: রাধারমণ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এইসব অধিকারকে প্রথম প্রজন্মের অধিকার (First generation rights) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।।** এইসব অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা মূলত নেতিবাচক। অর্থাৎ এইসব অধিকারভোগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা এলে রাষ্ট্র তা অপসারণ করবে কেবলমাত্র। জনগণের এইসব অধিকার মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কোনো অসুবিধা নেই। তবে যেসব রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক বা সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে এইসব অধিকারের ওপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ সভার প্যারিস সম্মেলনে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণার খসড়াটি সর্বসম্মতভাবে (৪৮-০) গৃহীত হলেও ৮টি সদস্যরাষ্ট্র কোনো না কোনো কারণে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ঘোষণাপত্রের ১নং ধারায় উল্লিখিত 'মর্যাদা ও অধিকার-এর বিচারে সকলে সমান'-এই কথাটি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণ করা অসুবিধা ছিল; তাই সে অনুপস্থিত ছিল। অনুরূপভাবে সৌদি আরব অনুপস্থিত ছিল, কারণ ঘোষণাপত্রের ১৮নং ধারায় উল্লিখিত ধর্ম পালন ও পরিবর্তনের অধিকারটি স্বীকার করা তার মতো মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার সোভিয়েত রাশিয়া ও তার অনুগামী ৫টি দেশ অনুপস্থিত ছিল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে। তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, ঘোষণাপত্রে 'বুর্জোয়া স্বাধীনতা' ও সম্পত্তির অধিকারের ওপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সে তুলনায় গুরুত্ব পায়নি।

এবার আসা যাক **দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলির** (Second generation Rights) ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলতে নাগরিকদের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলিকে বোঝানো হয়।[1] এইসব অধিকার-এর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে জটিল। **এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হয়।** উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ১১ (১) ও ১১ (২)নং ধারা দুটি উল্লেখ করা যেত পারে। প্রথমটিতে পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকারসহ প্রত্যেকের নিজের এবং তার পরিবারের জন্য জীবনযাত্রার একটি পর্যাপ্ত মানের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ধারায় প্রত্যেকের ক্ষুধা থেকে মুক্ত থাকার মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। এই ধরনের অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাষ্ট্রকে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হবে এবং অনেক বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। 'রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়িত না হবার অধিকার'—এই ধরনের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে খুব বেশি সক্রিয় হতে হয় না, শুধু নিপীড়ন বন্ধ করলেই চলে। কিন্তু মানুষকে 'ক্ষুধা থেকে মুক্ত' করতে হলে প্রত্যেকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করলেই হবে না, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটাতে হবে, যা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখে প্রায় অসম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পন্ন চুক্তিপত্রটি অনুমোদন করেনি।

বর্তমানে মানবাধিকারের ধারণটি **তৃতীয় প্রজন্মে** (Third Generation) এসে পৌঁছেছে। মানবাধিকারের ধারণা আজ আর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মানবাধিকার রক্ষা বলতে আজ আর শুধু মানুষের ব্যক্তিগত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাই বোঝায় না, একইসঙ্গে বোঝায় কোনো দেশ বা জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বিকাশের অধিকার। মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে আজ যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিও অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনি অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবাধিকার।[2] বিশ শতকের ষাটের দশকে উপনিবেশবাদের অবসান, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি ইত্যাদির ফলে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, পৃথিবীর সবদেশের বা সব শ্রেণির মানুষের তাতে উপকার হয়েছে তা নয়। শিল্পায়ন একদিকে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণির তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল শ্রেণির মানুষের দুর্গতি বাড়িয়েছে, বনাঞ্চল ধ্বংস করেছে, উপজাতি শ্রেণির মানুষদের বাস্তুচ্যুত করেছে অথবা তাদের সাবেক জীবন ও জীবিকার ওপর আঘাত হেনেছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে, দূষণের মাত্রা বাড়িয়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দাবিতে নানা

কারের আন্দোলন দানা বেঁধেছে। পশ্চিমী জগতের মানুষ পরিবেশ দূষণ বিরোধী এবং শান্তিমূলক আন্দোলন সংগঠিত করেছে; অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দুর্নীতিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামরিক ও পারমাণবিক শক্তির অপপ্রয়োগ বিরোধী আন্দোলনে নেমেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গড়ে উঠেছে যারা পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে শিশু নির্যাতন, নারী নির্যাতন, লিঙ্গ-বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই এসব আন্দোলনের লক্ষ্য ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না, এগুলির লক্ষ্য সমষ্টিগত উন্নয়ন। **দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মুক্তির অধিকার, পৃথিবীর সমস্ত শ্রেণির মানুষের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার—এগুলিই হল আজকের দিনের মূল দাবি এবং এগুলিকেই বলা হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার।**

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানবাধিকারের ধারণাটি একটি সম্প্রসারণশীল ধারণা। সমাজ-নিরপেক্ষ এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে প্রযোজ্য অপরিবর্তনীয় 'বিশুদ্ধ' মানবাধিকার বলে কিছু নেই। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই ধারণা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবাধিকারের ধারণা সমাজ-নিরপেক্ষ বিমূর্ত ও শাশ্বত নয়, বরং ক্রমবিকাশমান ও সতত পরিবর্তনশীল।

● মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি (Human Rights and International Politics) :

আগেই বলা হয়েছে, মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি কোনো সমাজ-নিরপেক্ষ বিমূর্ত ধারণা নয়; কাল-ভেদে এবং দেশ-ভেদে ধারণাটি পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজকীয় ও ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাম্য ও সমানাধিকারের ধারণাকে জনপ্রিয় করা হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং নৃশংস ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার এবং এ প্রসঙ্গে একটি সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য। এই বিশ্ব বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৪৫-এ গড়ে ওঠা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ১নং ধারায় সকলের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা কর্তৃক গৃহীত হয় **মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র।**

আবার এই মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদের ভিত্তিতে পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র প্রণয়নের জন্য যখন আলাপ-আলোচনা চলছিল, তখন দেখা গেল জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐকমত্যের অভাব। আসলে তদ্দিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। শুরু হয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যথাক্রমে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই। এই দুই শিবিরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার জন্যই তারা চুক্তিপত্র প্রণয়নের ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক ও সদ্য-স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি জোর দিল

চুক্তিপত্রে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে কাজের অধিকার, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তা মেনে নেয়নি। পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে কৃত্রিমভাবে আলাদা করে দুটি পৃথক চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৬৬ সালে সাধারণসভা কর্তৃক তা গৃহীত হয়।

দুই বিরুদ্ধ শিবিরের মতাদর্শগত সংঘাতের অশুভ প্রভাব শুধু জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রয়াসের ওপরই পড়েছিল তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বেছে বেছে তাদের অনুগামী দেশগুলিকে মানবিক এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক দেশ হয়েও তারা তাদের কিছু সমর্থক দেশের স্বৈরশাসনকে সমর্থন করেছে এবং ওইসব দেশের শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান-প্রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালে আরব বাসভূমি প্যালেস্তাইনে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইস্রায়েল কোনো না কোনো আরব দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছে। ১৯৮২ সালের জুন মাসে ইস্রায়েল লেবানন আক্রমণ করে এবং লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ৭,০০০ সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। আগস্ট মাসে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় ইস্রায়েলের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি তার বিরোধিতা করেন। আমেরিকার প্রশ্রয়ে উৎসাহিত হয়ে ইস্রায়েল বেইরুটে উপকণ্ঠে অবস্থিত সাব্রা ও শাতিলার প্যালেস্টাইনীয় শরণার্থী শিবিরগুলির ওপর নির্বিচারে হামলা চালায় এবং অসংখ্য প্যালেস্টাইনীয় শরণার্থী নিহত হন। যেসব অস্ত্র দিয়ে এইসব নিরস্ত্র শরণার্থী শিবিরের ওপর আক্রমণ চালানো হয়, সেগুলির সিংহভাগই ছিল মার্কিন অস্ত্র। ইস্রায়েল এখনও গাজা ও ওয়েস্টব্যাঙ্ক অঞ্চলে যথেচ্ছ গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। আরব জঙ্গি সংগঠনগুলি যখন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হয় তখন 'সন্ত্রাস', 'সন্ত্রাস' বলে চিৎকার করে আমেরিকা। অথচ ইস্রায়েল যখন আরবদের ওপর নির্দয়ভাবে হত্যালীলা চালায় তখন সে চোখ ফিরিয়ে থাকে।

মার্কিন আইনে বলা হয় গুপ্তহত্যা, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করা 'সন্ত্রাসবাদী' কাজ। অথচ ১৯৬১ সালে কঙ্গোর (অধুনা জাইর) প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করা হয় 'সিয়া' (CIA)-র প্রত্যক্ষ মদতে। ১৯৭৩ সালে চিলির রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে মার্কিন চক্রান্তের শিকার হয়ে নিহত হন। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিকল্পে কিছু সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং চিলির নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আলেন্দেকে হত্যা করে তাঁর জায়গায় বসানো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ পিনোচে-কে।

১৯৮৯ সালে চিনের নতুন প্রজন্মের বিদ্রোহ দমনে তিয়েন আন মেন স্কোয়ার-এ

ব্যাপক বলপ্রয়োগের প্রতিবাদে মার্কিন প্রশাসন চিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চালু করে এবং তাকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের (Most Favourite Nation) মর্যাদা দানে বিলম্ব ঘটায়। আবার সেই আমেরিকাই ১৯৮০-র দশকে নিকারাগুয়ার অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসক সোমোজাকে পূর্ণ মদত দেয় ব্যাপক গণহত্যার কাজে। মার্কিন অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে পুষ্ট 'কনট্রাস' (contras) নামক এক গুপ্তঘাতক বাহিনী নিকারাগুয়ার প্রায় ৩৫,০০০ অসামরিক নাগরিককে হত্যা করে। ১৯৯৯ সালে সার্বিয়াতে বোমাবর্ষণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটিকে একটি 'মানবিক হস্তক্ষেপ' (Humanitarian intervention) বলে দাবি করে।

সারা বিশ্বে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য, মানবাধিকার রক্ষার জন্য মার্কিন প্রশাসনের চোখে ঘুম নেই। অথচ স্বার্থে আঘাত লাগলে বা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-এর আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে তার কোনো কুণ্ঠা নেই। ১৯৫২ সালে ইরানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেগকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে শাহ্ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মোসাদেগের 'অপরাধ' ছিল এই যে, তিনি ইরানের তৈল ভাণ্ডারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। মার্কিন মদতপুষ্ট শাহ্ জমানা ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কেবল ভিয়েতনামেই মার্কিন সেনারা ন্যাপাম বোমা বর্ষণ করে, নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, রাসায়নিক বিষ ও বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে গাছপালা, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিয়া (CIA)-র প্রত্যক্ষ মদতে ইন্দোনেশিয়াতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। সিয়া-র সঙ্গে যোগসাজসে সুহার্তো, নাসুতিয়ান প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক নেতা ইন্দোনেশিয়াতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং অসংখ্য কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট সমর্থকদের হত্যা করেন।[1]

শুধু ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলিই নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়াসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারগুলিকে অনেকাংশে সংকুচিত করেছিল। সোভিয়েত প্রশাসনের সমালোচনা করায় সলঝেনিৎসিন, শাখারভ প্রমুখ নোবেলজয়ী চিন্তাবিদদের দেশ ছাড়তে হয়েছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার নামে কার্যত একদলীয় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল যেখানে জনসাধারণ বহুলাংশে ন্যায্য অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। সমালোচকেরা স্তালিনের আমলকে লাল স্বৈরতন্ত্রের (Red Bonapartism) বলতেন। সেই পর্যায়ে সংখ্যাতীত মানুষ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়েছিল। ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা সমগ্র তৃতীয় বিশ্বকে তথা সমাজতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষকে খুবই বিচলিত করেছিল। বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিনে সম্প্রতি বাজারমুখী অর্থনীতিকে কিছুটা গ্রহণ করা হলেও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বিন্দুমাত্র

কমানো হয়নি। ১৯৮৯ সালে চিনের তিয়েনআন মেন স্কোয়ারে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত তরুণ প্রজন্মকে কঠোরভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমিয়ে দেওয়া হয়।

ঠান্ডা লড়াই-উত্তর পর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কোনো অংশে কমেনি। তবে এই পর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির সিংহভাগ ঘটেছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও তার দমনকে কেন্দ্র করে। গত শতকের শেষ দুই দশকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের জঙ্গি গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অসম্ভব বেড়ে যায়। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কোনো না কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এমন সব পদক্ষেপ নেয়, যা সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে, নিহত হন সাধারণ নিরীহ মানুষ, লঙ্ঘিত হয় তাঁদের জীবনের অধিকার। আবার এইসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি যখন প্রতি-আক্রমণ চালায় তখনও শত শত নিরপরাধ মানুষের জীবনহানি ঘটে। সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদের একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক ধরন তৈরি হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণের কারণে হোক অথবা ধর্মীয় কারণে হোক অত্যাচারিত রাষ্ট্রীয় সমাজের একটা অংশ যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মেতে ওঠে, তখন তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র, অর্থ ও মদত পেয়ে যায়, কখনও কখনও রাজনৈতিক আশ্রয়ও পেয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি পাকিস্তানের কাছ থেকে, প্যালেস্তাইনীয় সন্ত্রাসবাদীরা আরব দেশগুলির কাছ থেকে মদত পায়। এইভাবে সন্ত্রাসবাদ একটা আন্তর্জাতিক রূপ পেয়ে যায়। তবে সন্ত্রাসবাদের আসল আন্তর্জাতিকরণ ঘটে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আল-কায়দা জঙ্গিদের দ্বারা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রান্ত হওয়ার পর।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সন্ত্রাসবাদ ছড়ায় কেবল মুসলিম মৌলবাদ। ইউরোপে বহু খ্রিস্টান মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে, জাপানে আছে আওম সিনরিকিও (Aum Shinrikyo), ভারতেও কিছু অ-মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন রয়েছে। কিন্তু তেলশোষক আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসবাদ মানেই মুসলিম সন্ত্রাসবাদ, যার কেন্দ্রে রয়েছে ওসামা বিন লাদেন পরিচালিত আল-কায়দা। সারা বিশ্বে এদের প্রায় ৬০টি আন্তর্জাতিক শাখা রয়েছে। রাশিয়ার চেচেন-বিদ্রোহী, ফিলিপিন্সের 'আবু সইফ' উগ্রপন্থী, প্যালেস্তাইনের আবু জুবেইদা বা কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী সকলেই আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত; এখানে সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা, সীমান্ত সব একাকার হয়ে এক অতিজাতিক কাঠামোর (trans-national structure) সৃষ্টি হয়েছে। এই স্পর্ধিত সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে 'অনন্ত ন্যায়ের যুদ্ধ' ('War for infinite justice') শুরু করেছে, তার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে অথবা আহত হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে যে দেশ সারা বিশ্বে অন্য দেশের কোটি কোটি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ চালিয়ে এসেছে, তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এহেন একটি দেশ যখন সারা পৃথিবীতে মানবাধিকারের অভিভাবক হয়ে বসতে চায়, তখন একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার মূল উদ্দেশ্য মানবাধিকার রক্ষা নয়, বরং নিজের স্বার্থ রক্ষা। নিজের

স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে মানবাধিকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক **স্যামুয়েল হান্টিংটন** ১৯৯৩ সালে বলেছিলেন, "মার্কিন নীতির মূল বিষয় হল গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বাজারের উন্নতি সাধন।"[1] হান্টিংটন-এর এই মন্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মার্কিন নীতি নির্ধারকেরা সরাসরি মানবাধিকারের সঙ্গে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থবাহী মুক্ত বাজারের বিষয়টি জড়িয়ে রাখেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ., বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি আর্থিক সংস্থাগুলি মার্কিন ধাঁচে মানবাধিকার রক্ষার যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এই সমস্ত আর্থিক সংস্থার কার্যকলাপ ও শর্ত আরোপ প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের নাগরিকদের জীবনধারণের অধিকার বা সম্বল কেড়ে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সাহস ও ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলেছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলি ছয়ের দশক ও সাতের দশকে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবাদে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আগ্রাসন ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল, আজ তারাই পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে নতজানু হয়ে পড়ছে।

যে সমস্ত উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক মানুষকে স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমগুলির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীতে যত বিদেশি সংবাদ মাধ্যম রয়েছে তার নব্বই শতাংশই নিয়ন্ত্রিত হয় উত্তর গোলার্ধের চারটি সংবাদ-সংস্থার দ্বারা। এইসব সংবাদ-মাধ্যম এবং তৎসহ শতশত সংবাদপত্র, পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন এবং ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিশাল জাল বিস্তার করেছে। এগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বের জনমতকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অনুকূলে প্রভাবিত করা হচ্ছে। সংবাদ-মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে কীভাবে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করা যায়, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ইরাক যুদ্ধের সময়। এইসব সংবাদ-মাধ্যমের সাহায্যে সারা পৃথিবীকে জানানো হয়েছিল যে, ইরাকের দখলদারী বাহিনী কুয়েতের শিশু হাসপাতালে শত শত শিশুকে হত্যা করেছে। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা এ ধরনের অমানবিক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পরে জানা গেল, উক্ত শিশুহত্যার কাহিনীটি ছিল পুরোপুরি মনগড়া এবং চক্রান্তের ফসল।[2] ১৯৮৯ সালে চিনের তিয়েনআনমেন স্কোয়ার-এ 'গণতন্ত্রকামী' শক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঘটনা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নক্কারজনক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নেমে এসেছিল ১৯৮০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার কুয়াংজোতে। ধনতান্ত্রিক সংবাদ মাধ্যমগুলি সেই ঘটনার ভয়াবহতা চেপে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। এইভাবে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ

করা যায় সংবাদমাধ্যমগুলির ওপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ব্যাপক মানুষের প্রকৃত সংবাদ ও তথ্য জানার অধিকার হরণ করেছে এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াবার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকারের ধারণাটি কোনো বিমূর্ত শ্রেণি-ঊর্ধ্ব ধারণা নয়, এর পিছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট রাজনীতি। যারা যে অবস্থানে আছে, সেইভাবে তারা মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করে। **দীপংকর চক্রবর্তী** তাঁর 'মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও রাজনীতি এবং তৃতীয় বিশ্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন : "মানবাধিকারের রাজনীতিকে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে (এক) মানবাধিকার বলতে মূলত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই বোঝানো হয় ....; (দুই) আজকের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বৈষম্য রয়েছে, তার অবসানকে মানবাধিকার রক্ষা ও অর্জনের কর্মসূচিতে স্থান দেওয়া যায় না; (তিন) সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্বাধীন ও স্বার্থবাহী যে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে, তার স্বার্থরক্ষা করাটাই কার্যত মানবাধিকার রক্ষার মূল কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ায়। এর বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে (এক) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়; (দুই) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানের প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের ধারণাকে স্থাপিত করতে হয়; এবং (তিন) সেই বৈষম্যভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করাটাকেও মানববিকার রক্ষার কর্মসূচিতে স্থান দিতে হয়।"

• সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

সমসাময়িক বিশ্ব যেসমস্ত জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল সন্ত্রাসবাদ। এটি কোনো বিশেষ অঞ্চল বা দেশের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র পৃথিবীরই সমস্যা। ছোটো-বড়ো, উন্নত-অনুন্নত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব ধরনের রাষ্ট্রই আজ কমবেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার। এই বিশ্বায়িত সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে আজকের দুনিয়া বিপন্ন, বিপন্ন মানবসভ্যতা। উন্মত্ত হিংসা এবং বিকৃত মানসিকতা থেকে জাত সন্ত্রাস তথা নাশকতার বলি শুধু মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি নয়, দেশে দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থাও। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও গুপ্ত সংগঠনগুলি একের পর এক দেশের জনসমাজগুলির ওপর আঘাত হেনে চলেছে। কখনও ধর্মীয় মৌলবাদকে সম্বল করে, কখনও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও হতাশাকে অবলম্বন করে তারা নেমে পড়েছে এক পৈশাচিক উন্মত্ততায়। ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে বিশ্বের মানুষ একটু শান্তি ও সুস্থিতি আশা করেছিল। কিন্তু সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি বিশ্বের মানুষকে আরও বেশি অশান্তি ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিল। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশই একমত যে, সন্ত্রাসবাদ কোনো এক বা একাধিক দেশের অভ্যন্তরীণ

বা জাতীয় সমস্যা নয়, এটি একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এই সমস্যার মোকাবিলাও করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে।

• সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা [Definition of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা যথেষ্ট কঠিন, কারণ বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া কোনো একজনের কাছে যেটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত হয়, অন্যজনের কাছে তা স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মনে হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, ভগৎ সিং, প্রমুখের সংগঠিত লড়াই ভারতবাসীর কাছে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদ বলতে বোঝায় **হিংসার প্রয়োগ অথবা হিংসা প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি বা ত্রাস সঞ্চার করার প্রয়াস।** আতঙ্কের আবহ তৈরি করে বা আতঙ্কিত করে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা একদল মানুষকে এমন কোনো কাজ করতে বা না-করতে বাধ্য করা হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কাজ সে বা তারা করতো না, তাহলে তাকে বলা হবে সন্ত্রাসবাদী কাজ। **আমির তাহেরি (Amir Taheri)**-র মতে, "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধের নিয়মকানুনের বাইরে যে-কোনো প্রকার হিংসাপ্রয়োগ এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আতঙ্কের প্ররোচনা দেওয়া সন্ত্রাসবাদী কাজ।"[1]

জেনকিন্স (Brian M. Jenkins)-এর মতে, সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে বলপ্রয়োগ অথবা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন। ইজরায়েল-এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু** একদা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনা প্ররোচনায় এবং অতর্কিতে এমন সুসংবদ্ধভাবে অন্তর্ঘাত ও হত্যালীলা চালানো হয় যার পরিণতিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কারও কারও মতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও ধর্মীয় বা অন্যান্য লক্ষ্য থাকতে পারে। মার্কিন চিন্তাবিদ **নম চমস্কি** বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ বলতে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে হিংসার পরিকল্পিত প্রয়োগ অথবা হিংসা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনকে বোঝানো হয়। ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন (Federal Bureau of Investigation)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী **"সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শক্তি অথবা সম্পদের বিরুদ্ধে শক্তি অথবা হিংসার বেআইনি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সরকার বা অসামরিক জনগণ বা তার অংশবিশেষকে কোনো বিশেষ কার্যসম্পাদনে বাধ্য করা।"** আসলে 'terror' শব্দটির উৎপত্তিই হয়েছে লাতিন শব্দ *'terrere'* থেকে, যার অর্থ কাউকে ভয় দেখানো বা আতঙ্কগ্রস্ত করা (to frighten or scare)। **ব্রুস হফম্যান (Bruce Hoffman)**-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, একজন সন্ত্রাসবাদী হল মৌলিকভাবে হিংস্র বুদ্ধিজীবী ("fundamentally violent

intellectual), যে তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য বলপ্রয়োগে প্রস্তুত থাকে। আবার মার্কিন আইন বিভাগ সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছে, সন্ত্রাসবাদ হল পূর্বকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হিংসা, যা উপজাতীয় অথবা গুপ্তসংস্থা কর্তৃক কোনো অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর প্রয়োগ করা হয় ("The term terrorism means premediated politically motivated violence, perpetrated against non-combatant targets by subnational or clandestine agents.")।[1] রিচার্ড রুবেনস্টাইন (Richard Rubenstein) বলেছেন, জনপ্রতিনিধিদের দাবিকে সামনে রেখে কোনো ছোটো গোষ্ঠী বা সংগঠন যখন সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে নিযুক্ত থাকে, সেই গোষ্ঠী তখন সন্ত্রাসবাদী এবং তার ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদ নামে পরিচিত হয়। সাক্সেনা (N. S. Saxena) তাঁর *Terrorism : History and Fact* নামক গ্রন্থে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসাশ্রয়ী ধ্বংসাত্মক কাজকর্মই সন্ত্রাসবাদ পদবাচ্য।

১৯৮৭ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা সন্ত্রাসের একটি স্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরির উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়, যারা জাতি বিদ্বেষী বা ঔপনিবেশিক শাসন বা বিদেশি আধিপত্যবাদের (Hegemonism) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের কোনো মতেই সন্ত্রাসবাদী বলা যাবে না। বলাবাহুল্য এই প্রস্তাব সকল সদস্যরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। জাতিপুঞ্জ সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে মার্কিন কংগ্রেস ১৯৮৪ সালে সন্ত্রাসবাদের একটি সংজ্ঞা দেয়। সংজ্ঞাটি মোটামুটি এইরকম : "সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলতে বোঝায় কোনো হিংসাত্মক কাজ যা মানুষের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ যেকোনো দেশের ফৌজদারি আইনের পরিপন্থী এবং যে কাজ সাধারণ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও দমন করে, যে কাজ ভীতিপ্রদর্শন ও জোরজুলুম করে কোনো সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করে অথবা গুপ্তহত্যা ও অপহরণের মাধ্যমে কোনো সরকারের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।" ("An act of terrorism means any activity that [A] involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or any state, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of United States or of any state; and [B] appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population ; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by assassination and kidnapping.")[2]

সন্ত্রাসবাদের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, কতকগুলি ব্যাপারে এগুলির মধ্যে মিল আছে, যেমন—(১) সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক কাজকর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (২) সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর এক বা একাধিক লক্ষ্য থাকে; (৩) লক্ষ্য

পূরণের উদ্দেশ্যে তারা তাদের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে জনমানসে বিপুল ত্রাসের সঞ্চার করে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। (৪) সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণত জনাকীর্ণ লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানে যেমন বাজার, ব্যাংক, রেলওয়ে স্টেশন, যাত্রীবাহী যানবাহন ইত্যাদি।

সন্ত্রাসবাদের এই ধরনের সংজ্ঞার কিছু সমস্যাও আছে। প্রধান সমস্যা হল এই সমস্ত সংজ্ঞায় কেবল অরাষ্ট্রীয় কিছু কর্মকর্তাকে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদ রাষ্ট্রীয় স্তরেও সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ সবসময় সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও সন্ত্রাসবাদী পথ অনুসৃত হতে দেখা যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অন্যতম ধারা ছিল সন্ত্রাসবাদী ধারা।

• সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য [Nature and Characteristics of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

প্রথমত, সন্ত্রাসবাদ হল প্রকৃতিগতভাবে ষড়যন্ত্রমূলক। যে-কোনো সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পিছনে থাকে পরিকল্পিত গোপন ও গভীর ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। ব্যক্তি হত্যা, রাষ্ট্রনায়ক হত্যা, ধর্মস্থান অথবা বাজারে অথবা সিনেমা হলে বিস্ফোরণ, সেতু বা রেলপথ বা বিমান ধ্বংস ইত্যাদি যে-কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের আগে পরিকল্পনা রচিত হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী গোপন মহড়াও চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের নেতার নির্দেশে পরিচালিত হন এবং নেতার প্রতি তাঁদের অবিচল আনুগত্যও থাকে। নেতার নির্দেশমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা নিপুণভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট থাকেন। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির কাঠামোটি হয় সাধারণত পিরামিডের মতো। কাঠামোর শীর্ষে থাকেন একজন বা কয়েকজন নেতা, যাঁদের কাজ হল সমগ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে নীতি নির্ধারণ করা, লক্ষ্যবস্তু স্থির করা এবং পরিকল্পনা রচনা করা। এর নীচের স্তরে থাকেন বেশ কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সক্রিয় কর্মী এবং এঁদের মাধ্যমেই আক্রমণ বা হামলার কাজটি সম্পন্ন হয়। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন জনের ওপর বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব দেওয়া থাকে, যেমন কেউ তথ্য সংগ্রহ করেন, কেউ যোগাযোগ রক্ষা করেন, কেউ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন, কেউ তা প্রয়োগ করেন, কেউ নজরদারি করেন। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকেন নিষ্ক্রিয় সমর্থকগণ, যাঁরা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন এবং যাঁরা সক্রিয় কর্মীদের তথ্য সরবরাহ, নিরাপদ আশ্রয় দান, সতর্ক করা, পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

তৃতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ একটি আপেক্ষিক শব্দ। সাধারণ মানুষের কাছে সন্ত্রাসবাদ ঘৃণ্য, কাপুরুষোচিত এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আবার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও তার সদস্যদের কাছে এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। কারণ তাঁদের কাছে সন্ত্রাসবাদী পথ রাজনৈতিক দাবি আদায়ের একটা কৌশল মাত্র। সরকার তথা জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি করে দাবি

আদায়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সাংবিধানিক পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কার্যকর বলে তাঁদের বিশ্বাস। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের হিংসাত্মক কাজকর্মের মাধ্যমে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে তাতে সাধারণ নাগরিক সমাজ এমনভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে সাহস পায় না।

চতুর্থত, বর্তমান দিনে সন্ত্রাস কেবল দুর্বলের অস্ত্র নয়, সবলরাও এর সাহায্য নিতে পারে। বস্তুতপক্ষে আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় উভয় স্তর থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষভাবে। ভারতের কাশ্মীর উপত্যকায় যেসব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ক্রিয়াশীল আছে সেগুলি অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলেও তারা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পায়।

পঞ্চমত, বর্তমানের এই বিশ্বায়নের যুগে সন্ত্রাসবাদও একটা বিশ্বায়িত রূপ পেয়েছে। আজকের দিনে সন্ত্রাসকে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যাচ্ছে না; বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার, বিশ্বজুড়ে এর শাখা-প্রশাখা। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীলঙ্কার এল. টি. টি. ই (L.T.T.E)-র সঙ্গে অসমের আলফা জঙ্গিদের যোগাযোগ রয়েছে। অসমের আলফা জঙ্গিদের কাছে এমন কিছু রাইফেলও পাওয়া গেছে সেগুলি এল. টি. টি. ই-রা ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে কাশ্মীরের বা পাকিস্তানের মৌলবাদী সন্ত্রাসের যথেষ্ট যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, সন্ত্রাসবাদের উত্থানের পিছনে নানান কারণ থাকতে পারে, যেমন জাতি-বিদ্বেষ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি। কিন্তু বেশিরভাগ সন্ত্রাসবাদের পিছনে কাজ করে অর্থনৈতিক উপাদান। নেপালের মাওবাদীদের অথবা শ্রীলঙ্কার এলটিটিইদের অথবা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জঙ্গি আন্দোলনের পশ্চাতে কাজ করেছে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বঞ্চনা ও অনগ্রসরতা। অধ্যাপক দীপঙ্কর গুপ্ত-র মতে, বেশিরভাগ সন্ত্রাসের উৎস নিহিত থাকে অবহেলা-বঞ্চনার (humiliation) মধ্যে। সমাজে ব্যক্তির প্রান্তিক ও মর্যাদাহীন অবস্থান সন্ত্রাসের অনুকূল পরিবেশ রচনায় সাহায্য করতে পারে।

সপ্তমত, সন্ত্রাস আজ বহু যুবকের কাছে রুজি-রোজগারের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্র থেকে জানা যায়, কাশ্মীরের জঙ্গিদের একটা বড় অংশ নিছক জীবিকা নির্বাহের তাড়নায় এই পথে নেমেছে। আফগান মুজাহিদ জঙ্গিরাও শুরুতে জেহাদের রাস্তায় নেমেছিল রুজি-রোজগারের সন্ধানে। প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখণ্ডে গত শতকে 'ইন্তিফাদা' নামে যে সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রধানত বেকার যুবক-যুবতীরা। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে সংগঠিত অপরাধ জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা অপরাধ জগতের বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামোকে ব্যবহার করছে কখনও রাজনৈতিক কারণে, আবার কখনও অর্থসংগ্রহের তাগিদে। এ বিষয়ে খাদিমকর্তা অপহরণের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল

দেশগুলিতে জাল নোট পাচার, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির যোগসূত্র আজ প্রমাণিত।

অষ্টমত, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্প্রসারণের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীতে প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, আর এই উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বিশ্বজুড়ে নাশকতামূলক কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলেছে। ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, সেল ফোন, স্যাটেলাইট ফোন, বিস্ফোরণের নিত্যনতুন কৌশল, জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রের উদ্ভাবন—ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদকে প্রসারিত ও শক্তিশালী হতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। আজ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে হাতে ঘুরছে 'ডার্টি বোমা' নামক নিকৃষ্টমানের পরমাণু বোমা, অ্যানথ্রাক্স-র মতো মারণব্যাধির জীবাণু বোমা। এইসবের প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে 'জৈব সন্ত্রাসবাদ', 'পরমাণু সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদির নানা ধরনের সন্ত্রাস। বস্তুতপক্ষে, আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী ডালপালা মেলে চলেছে।

নবমত, সন্ত্রাসবাদ ও গেরিলা যুদ্ধ এক নয়। গেরিলাবাহিনী সামরিকবাহিনীর মতো সুসংগঠিত। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সাধারণ নাগরিক নয়, সামরিকবাহিনী। তারা বিরোধী পক্ষের সামরিকবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে তোলে এবং এলাকা দখল করে সেখানকার জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এলাকা দখল বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের কোনো পরিকল্পনা থাকে না।

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদেরও পার্থক্য আছে। একজন সাধারণ অপরাধী অর্থ উপার্জনের জন্য হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। তার কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য থাকে না। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদীরা একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। এদের কাজকর্ম আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নয়।

সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি থাকে; যুদ্ধরত পক্ষগুলি সেইসব নিয়মনীতি মেনে চলে। সন্ত্রাসবাদীরা কোনো নিয়মনীতি মানে না, নিয়ম না-মানাই তাদের কাজ। যুদ্ধ হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র বৈধ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বৈধ নয়, অবৈধ।

পরিশেষে, সন্ত্রাসবাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে, বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রেক্ষিতে **সন্ত্রাস এখন এক অতিজাতীয় (Transnational) চরিত্র অর্জন করেছে।** এবং এই অতিজাতীয় সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন **ওসামা বিন লাদেন।** এই নেতার অধীনস্থ প্রধান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি হল **'আল কায়দা'**, সারা পৃথিবী জুড়ে যার অন্তত ৬০টি শাখা রয়েছে। লাদেন-এর মূল লক্ষ্য হল ইসলাম ধর্মকে সুরক্ষিত করা এবং বিশ্বজুড়ে এর প্রসার ঘটানো। এই 'প্যান-ইসলামীয়' চিন্তাধারায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দেশ-কাল ভুলে এক হয়ে যায়। অধ্যাপিকা অঞ্জনা ঘোষ-এর ভাষায় : এই অতিজাতিক সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড, সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার চিরাচরিত প্রাচীরগুলিকে অতিক্রম করে এমন একটি ধর্মীয় আবেগের সঞ্চার করেছে যেখানে এক আফগান শরণার্থী, এক প্যালেস্তিনি জঙ্গি, এক ইন্দোনেশীয় চাষী অথবা কোনো চেচেন

বিদ্রোহীর অনুভূতি মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।" এই ইসলামীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমের ধনবাদী দেশগুলি কখনও কোনো ইসলামিক দেশের নিরীহ জনগণের ওপর বোমা বর্ষণ করছে অথবা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মাথা গলাচ্ছে। এই হল আজকের দুনিয়ার সন্ত্রাসের চেহারা।

• সন্ত্রাসবাদের প্রকারভেদ [Types of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদ নানা প্রকারের হতে পারে; যেমন জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি।

(১) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যখন কোনো একটি রাষ্ট্রে বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে **আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ** আখ্যা দেওয়া হয়। 'গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট'(জি. এন. এল. এফ), খালিস্তানিরা বা 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম' (এল. টি. টি. ই)-রা যে সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত করেছে তার প্রকৃতি আঞ্চলিক কারণ এর পরিধি স্ব স্ব রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এলটিটিই চায় শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে পৃথক তামিল রাজ্য (তামিল ইলম) গঠন করতে। জি. এন. এল. এফ চেয়েছিল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং জেলার তিনটি পাহাড়ি মহকুমা—দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংকে নিয়ে গোর্খা রাজ্য গঠন করতে। আবার ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশকে পৃথক খালিস্তান (পুণ্যভূমি) রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল খালিস্তানিরা।

(২) সন্ত্রাসবাদ যখন সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে সংগঠিত হয় তখন তা **জাতীয় সন্ত্রাসবাদ** বলে পরিচিত হয়। প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগঠন (PLO) সন্ত্রাসবাদের যে পথ অবলম্বন করেছে তার রয়েছে জাতীয় চরিত্র; তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য প্যালেস্তাইনের মাটিতে প্যালেস্তাইন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (IRA)-কেও জাতীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলা যেতে পারে, কারণ তাদের লক্ষ্য আয়ারল্যান্ডের পুনঃসংযুক্তিকরণ।

(৩) সন্ত্রাসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র যখন জাতিরাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় **আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ**। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিষয়ক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ কমিটির মতে, চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ নয় এমন একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে যখন কোনো ব্যক্তি বিদেশের মাটিতে কোনো বিদেশির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বর্বরতার কাজ চালায় তখন তা হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ("........... heinous act of barbarism committed in the territory of a third state by a foreigner against a person possessing a nationality other than that of the offender for the purpose of exerting pressure in a conflict not strictly internal in nature.")। মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মার্কিন ভূমিকার প্রতিবাদ জানাতে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ওসামা বিন লাদেন কর্তৃক বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগণ আক্রমণের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জ্বলন্ত উদাহরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, একটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কারও কাছে জাতীয় আবার কারও কাছে আন্তর্জাতিক রূপ নিতে পারে। যে-সব কাশ্মীরি ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে পৃথক কাশ্মীর রাষ্ট্র গড়তে চান, তাঁদের কাছে কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ 'জাতীয়' বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। আবার ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে তা আন্তর্জাতিক।

(৪) **সন্ত্রাসবাদ রাষ্ট্রের দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে।** কোনো রাষ্ট্র তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি ও সুস্থিতি বিঘ্নকারী কোনো শক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাকে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল হিটলার, মুসোলিনি ও স্তালিনের অত্যাচার। সাম্প্রতিককালে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী যেভাবে পরিকল্পিত উপায়ে প্যালেস্তাইনিয়াদের হত্যা করেছে, তাকে অনেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে থাকেন। কখনও কখনও কোনো বলশালী রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাতে পারে। দুর্বলতর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ।

(৫) সন্ত্রাসবাদের একটা বিশেষ ধরন হল **ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ**। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসার। পৃথিবীতে বেশ কিছু ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'হামাস' নামক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি ইসলামধর্মের সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে প্যালেস্তাইন অঞ্চলে লড়াই চালাচ্ছে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Jewish Defence League ইহুদি ধর্মের প্রসারের লক্ষ্যে সক্রিয় আছে। একইভাবে Christian Patriot Defence Leaugue, The Sword and the Arm of the Lord, The order, Posse Comitatus, Skinheads ইত্যাদি সংগঠন লড়ছে খ্রিস্টানধর্মের প্রসারকল্পে। এগুলিকে অনেকে খ্রিস্টান ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে অভিহিত করেন।

• রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস [State Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের একটা বিশেষ ধরন হল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। **সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র যখন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুস্থিতি বিঘ্নকারী কোনো শক্তি বা সংগঠনের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের প্রেক্ষিতে কঠোর দমন-পীড়ননীতি অনুসরণ করে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে তখন তা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস** আখ্যা পায়। স্তালিনের আমলে এবং পরে ব্রেজনেভ-এর আমলে সোভিয়েত রাশিয়ায় যেকোনো সরকার-বিরোধী শক্তি বা আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করা হত। পলপট শাসিত কাম্বোডিয়ায় (১৯৭৫-৭৯) রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন নৃশংসতম আকার নেয়। এছাড়া LTTE-দের দমনে শ্রীলঙ্কা সরকারের, ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ব টিমোরের স্বাধীনতা আন্দোলনের দমনে ইন্দোনেশিয়ান সরকারের, আয়ারল্যান্ডে সিনফেইনের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ড সরকারের কার্যকলাপকে অনেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আখ্যা দেন।

অনেক সময় কোনো রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে নিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত দেয়। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাতে মদতদানকারী রাষ্ট্র অর্থ, প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিয়ে

সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে। কখনও কখনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কর্মরত জঙ্গি সংগঠনগুলির সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। **রাষ্ট্রের তরফে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী কাজে ইন্ধন জোগানো এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।** অনেক সময় এই ধরনের সন্ত্রাসকে সীমান্ত পারের সন্ত্রাস (Cross-border Terrorism) বলে অভিহিত করা হয়। পাক সরকারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও আফগানিস্তানে এই ধরনের সীমান্ত অতিক্রমকারী সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। ইজরায়েল সরকারের মদত পেয়ে ইজরায়েলি জিয়নিস্ট গোষ্ঠী প্যালেস্তিনীয় এলাকায় নিয়মিত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এই ধরনের সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল ধারাবাহিক সন্ত্রাসমূলক কাজে সাহায্য করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অস্থিরতা তৈরি করা, জনমানসে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা।

কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লক্ষ্য থাকে অন্য কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনানুগ সরকারকে কৌশলে উচ্ছেদ করে তার বদলে নিজের অনুগত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে আসা। এই ধরনের কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধহস্ত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করে তার বশংবদ স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৩ সালে চিলিতে সমাজতন্ত্রী নেতা আলেন্দে-কে হত্যা করে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি জেনেরাল গোষ্ঠীর হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষান্ত হয়। লাতিন আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট দেশ কিউবা। সেটি কিউবার কমিউনিস্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে এবং তার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আমেরিকা সেই কেনেডির আমল থেকে আজ পর্যন্ত নানা অন্তর্ঘাত চালিয়ে আসছে। এছাড়া লিবিয়া, নিকারাগুয়া থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক অতীতে আফগানিস্তান ও ইরাকসহ একাধিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্ন শিকার হয়েছে।

যুক্তি যাই থাকুক না কেন, যেকোনো ধরনের সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, তা সে কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী দ্বারা অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হোক না কেন। ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে অথবা বিমান থেকে বোমা ফেলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা নিকৃষ্টতম অমানবিক কাজ, আর এই কাজটিই করে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। এই ঘৃণ্য মার্কিন নীতিকে বিদ্রূপ করে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী **নোয়াম চমস্কি** (Noam Chomsky) তাঁর *'A Changed World? Terrorism Reconsidered, Middle East, Illusion'* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের (অর্থাৎ মার্কিন নাগরিকদের) বিরুদ্ধে আঘাত হলে তা অবশ্যই সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু আমেরিকা যা করে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়" ("Terrorism is terrorism against us, excluding what we do to them.")।

• সন্ত্রাসবাদের উৎস [The Source of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে; তবে প্রধান কারণ হল **বঞ্চনাবোধ** (a sense of deprivation)। অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ থেকে জন্ম সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম। শিক্ষিত সুবিধাকামী ছিন্নমূলদের মধ্যেও এক ধরনের

বঞ্চনাবোধ, অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা কাজ করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন জার্মানরাই হল পৃথিবীর একমাত্র খাঁটি আর্য; সুতরাং বিশ্বকে শাসন করবার একচেটিয়া অধিকার জার্মানদের হাতেই থাকা উচিত। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল ইহুদিরা এবং কমিউনিস্টরা যুগপৎ জার্মানদের বিকাশে ও আধিপত্য বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করছে। এই প্রত্যয় থেকে তিনি ক্রমশ ঘোরতর ইহুদি বিরোধী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। ভারতের উত্তর পূর্ব অংশে আলফা জঙ্গিসহ অন্যান্য যেসব জঙ্গিগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরও মূলে আছে এক ধরনের বঞ্চনাবোধ। তাদের ধারণা ভারত সরকার নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলির অধিবাসীদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে থাকে। তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাঁদের ধারণা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁরা তাঁদের দাবি আদায়ে সমর্থ হবেন না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি আন্দোলনের পথকেই দাবি আদায়ের তথা সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে তাঁরা মনে করেন।

এখন প্রশ্ন হল কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠন কখন সন্ত্রাসবাদী পথের আশ্রয় নেয়? উত্তরে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি আদায়ের বা সমস্যা সমাধানের সহজ-সরল রাস্তা খোলা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে না। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠন দেখে যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে কোনো লাভ নেই, আবার সম্মুখ সমরে হাতাহাতি লড়াই করে জেতার মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতাও তাদের নেই, তখন তারা বাধ্য হয় সন্ত্রাসের পথ ধরতে, গুপ্তহত্যা, গেরিলা কায়দায় অতর্কিত আক্রমণ, আত্মঘাতী আক্রমণ ইত্যাদি পথ ধরতে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর প্যালেস্তিনিয়রা যখন বুঝল যে, অসংগঠিত প্যালেস্তিনিয়রা দূরে থাক, আরবের কোনো সেনাবাহিনীই মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না, তখন পি এল ও (PLO)-র আঘাত হানার শক্তি হয়ে উঠল আলফাতাহ। ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় প্যালেস্তিনিয়দের বাড়িঘর ধূলিসাৎ করছে, অথচ প্যালেস্তিনিয়রা না পারছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর গুঁড়িয়ে দিতে, না পারছে ইসরায়েলি বুল ডোজারগুলির গতিরোধ করে তাদের ধ্বংসলীলা থামাতে। এই অবস্থায় গেরিলা আক্রমণ ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথই খোলা রইল না।

অনুরূপভাবে ইরাকিরা যখন দেখল মার্কিন জোটশক্তির সঙ্গে মোকাবিলায় তারা পেরে উঠবে না, কারণ এই শক্তির পিছনে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধবিমান, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র, হমিং ডিভাইস, অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র—তখন তারা অবলম্বন করল গেরিলা কায়দায় **'মেরে পালাও' (Hit and Run)** রণকৌশল। একটা ব্যাপারে এখনও তারা নিশ্চিত যে, আত্মঘাতী আক্রমণ ছাড়া জোট বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের কাবু করা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

● আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদের প্রসার [Expansion of Terrorism at International Level] :

গত শতকের শেষ দিকে 'সন্ত্রাস' শব্দটি একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে। প্যালেস্টাইনের আরব গেরিলাদের কার্যকলাপ ও তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানুষ সন্ত্রাসবাদী

কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা পেতে থাকে। প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীদের বিতাড়িত করে অথবা হত্যা করে ইহুদিরা ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠন করে। তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষের সূত্রপাত। ইস্রায়েলের পক্ষে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু ধনতান্ত্রিক দেশ। অন্যদিকে বিতাড়িত প্যালেস্তাইনীয় অধিবাসীদের পক্ষে যোগ দেয় মিশর, লেবানন, সৌদি আরব, ট্রান্স জর্ডান, সিরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র। ১৯৬৪ সালে প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগঠন (Palestine Liberation Organisation, সংক্ষেপে PLO) গঠন করে ইস্রায়েলের হাত থেকে নিজ দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে প্যালেস্তাইনের আরবরা ইস্রায়েল বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করে দেয়। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১১ জন ইস্রায়েলি খেলোয়াড়কে প্যালেস্তাইনীয় জঙ্গিরা হত্যা করে। স্বাভাবিকভাবেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী মুখর হয়ে ওঠে। তখন থেকেই সন্ত্রাস আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে।

১৯৮০-র দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিস্তারলাভ করে। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন সশস্ত্র জঙ্গিগোষ্ঠী। এরা এমন অনেক পদক্ষেপ নেয় যার বলি হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ। কখনও কখনও রাষ্ট্রনেতারা ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা, উদ্যোগপতিরা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ হারান। এইভাবে ইজিপ্টের রাষ্ট্রপ্রধান আনোয়ার সাদাত (১৯৮১), ভারতের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (১৯৮৪) এবং শ্রী রাজীব গান্ধী (১৯৯১) সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হয়েছেন।

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রটি এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান কার্যালয় পেন্টাগন একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হলে গোটা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচকিত হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকেই সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। এই বিশ্বায়িত সন্ত্রাসের ভরকেন্দ্রে রয়েছে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ—একদিকে ইসলামিক মৌলবাদী ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়দা এবং অপরদিকে তা প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পাল্টা-সন্ত্রাসে বিশ্বাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লাদেনের আল কায়দা নামক সংগঠনটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা মুসলিম মুজাহিদদের। ৬০টি দেশে এই সংগঠনের শাখা রয়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ফিলিপাইন্স-এর 'আবু-সয়াফ' গোষ্ঠীর, রাশিয়ার চেচেন বিদ্রোহীদের, প্যালেস্তাইনের হামাস, কাশ্মীরের লস্কর-ই-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর।

আল-কায়দা তথা মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা দুনিয়ার সমস্ত নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে বিশ্বকে অনেক বেশি সন্ত্রস্ত করেছে। আল কায়দাকে দমনের নামে মার্কিন সামরিক বিভাগ ও গোয়েন্দা দপ্তর কখনও তালিবান শাসনাধীন আফগানিস্তানে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, কখনও বা ইরাককে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। 'Operation Enduring Freedom',

'Operation Anaconda', 'Operation Desert Storm' ইত্যাদি গুরুগম্ভীর নামের সব অভিযান চালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং জাতীয় সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। আফগানিস্তানে 'Cluster Bomb'-এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। বোমাবর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি হাসপাতাল, বৃদ্ধাবাস এবং রেডক্রসের গুদাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতি-সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলি কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সন্ত্রাস কমেনি বরং বেড়েছে। মার্কিন সন্ত্রাসের জবাবে আল কায়দা তার সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে। ভারত, ব্রিটেন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, পাকিস্তান কেউই এই আতঙ্কবাদী সন্ত্রাসের বিশ্বজোড়া জাল থেকে মুক্ত নয়।

● আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর সন্ত্রাসবাদের প্রভাব [Impact of Terrorism upon International Relations] :

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বহু আলোচিত বিষয় হল সন্ত্রাসবাদ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশ্বের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংঘটিত হতে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বিশ্বজুড়ে জাল বিস্তার করে ফেলেছে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ এক অতিজাতিক (transnational) এবং আন্তঃমহাদেশীয় আকার ধারণ করেছে। এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে শুধুমাত্র কিছু বেসরকারি সংগঠন বা গোষ্ঠী নয়, রাষ্ট্রও সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে গিয়ে সমানতালে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তার জন্য রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের সন্ত্রাসই দায়ী।

আজকের দিনে সন্ত্রাস কোনো রাষ্ট্রকেই রেহাই দেয়নি, তা সে উন্নত হোক আর অনুন্নত হোক। বস্তুতপক্ষে **কী অনুন্নত কী উন্নত সমস্ত দেশের প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসজনিত ভীতি ও উদ্বেগের শিকার।** কিছু দিন আগে পর্যন্ত বিশ্বের শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যেভাবে নিরাপদে বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করে যেত, এখন আর তারা ততটা নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে কাজ করে যেতে পারে না সন্ত্রাসবাদের কারণে।

কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, **সন্ত্রাস যেমন ছোট-বড় সব রাষ্ট্রকেই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে, তেমনি উল্টোদিকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগও করে দিয়েছে।** সন্ত্রাসবাদজনিত নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার কাজটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে আতঙ্কগ্রস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করাকেই নিজেদের আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করছে।

কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের মতে, **সন্ত্রাসবাদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটিকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে।** জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তার নীতি অনুসারে বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করলে বা করতে উদ্যত হলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সমবেতভাবে আগ্রাসী ও শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করতে

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিদ্যমান সুস্থিতি বিঘ্ন করতে উদ্যত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা কতখানি কার্যকর হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ প্রথমত, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সংঘটিত হয় না। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বর্তমানে বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক রয়েছে। তৃতীয়ত, শান্তিবিঘ্নকারী কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে যেভাবে যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব, কোনো অজানা অনির্দিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সেরূপ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। চতুর্থত, জাতিপুঞ্জ কখনও কখনও বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। কিন্তু শান্তিবিঘ্নকারী শক্তি যখন কোনো এক বা একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, তখন তা সম্ভব নয়। কারণ জাতিপুঞ্জ কেবল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নয়।

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে এক-মেরু ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকে প্রতিস্পর্ধা (challenge) জানানোর মতো শক্তি আর নেই—এরূপ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এর বিমান হানার মাধ্যমে আল কায়দা শুধু বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আকাশচুম্বী ইমারতকেই ধূলিসাৎ করেনি, ধূলিসাৎ করেছিল এক-মেরু বিশ্বের অধিপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গগনস্পর্শী অহংকারকেও। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করল, তা যেকোনো হিংস্র বর্বর জাতিকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। আল কায়দার সর্বাধিনায়ক ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করার নামে মুসলিম অধ্যুষিত আফগানিস্তান ও ইরাকের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে অথবা জখম করেছে, বহু জনপদকে শ্মশানে পরিণত করেছে। মানবাধিকার ও সভ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইরাকে তাণ্ডব চালাল ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী। ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন বাগদাদ শহর বধ্যভূমিতে পরিণত হল। জাতিপুঞ্জ যথারীতি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল। উত্তর গোলার্ধের বড়ো বড়ো বাণিজ্য সংস্থা নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন কার্যকলাপকে সন্ত্রাসবাদ বলল না। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিখাইল স্টোল (Michael Stohl)-এর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "বৃহৎ শক্তিবর্গ যখন তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করে ও হত্যালীলা চালায়, তখন আমরা তাকে বলি দমনমূলক কূটনীতি (*coercive diplomacy*); তাকে আমরা সন্ত্রাসবাদ বলি না।"[1] উক্তিটি করেছিলেন আজ থেকে সতেরো বছর আগে (আলেক্স জর্জ সম্পাদিত *Western State Terrorism* নামক গ্রন্থে)। সেপ্টেম্বর ২০০১-এর বিমান হানার জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান ও ইরাক নীতি সম্পর্কে স্টোল কী মন্তব্য করতে পারেন, তা আন্দাজ করা যায়।

অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশ্বজোড়া ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্য একটাই। সেটা হল বিশ্বের সর্বত্র তার অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯২ সালের ২ রা জুন *New York Times* পত্রিকায় নয়া-উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবর্তক টমাস ফ্রিডম্যান লিখেছিলেন

যে, "ঠান্ডা লড়াই-এ আমেরিকার জয় কতকগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির জয়, যেমন গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার।" স্যামুয়েল হান্টিংটন প্রায় একইভাবে বলেন, "মার্কিন নীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বাজারের উন্নতিসাধন।" কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আল কায়েদা'কে মদত দেওয়ার অভিযোগে পশ্চিম এশিয়ার কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে 'সভ্যতার পক্ষে সংগ্রাম' আখ্যা দিয়ে হান্টিংটনের মতো বুদ্ধিজীবীরা এক ধরনের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বৈধতা দিতে সক্রিয় হয়েছেন। তাঁদের মতে, এই সংগ্রাম নতুন কিছু নয়, এ হল বর্বর ইসলামিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুসভ্য খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতির লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলি কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সুসংহত ও শক্তিশালী করার কাজে সক্রিয় আছে এবং মাঝে মধ্যে মার্কিন দূতাবাস, পর্যটনকেন্দ্র ইত্যাদিতে হানা দিয়ে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। এককথায় আজকের বিশ্বে সন্ত্রাস ও আতঙ্কের 'প্যান্ডোরা বাক্স'টি খোলা অবস্থায় রয়েছে। যে কেউ যে কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির প্রচলিত কাঠামোকে বিকল করে দেওয়ার এক ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি তাদের বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ককে সম্বল করে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্যে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও কোনো দেশ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে এইসব সংগঠনকে সন্ত্রাস চালানোর কাজে মদত দিচ্ছে এবং তার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল ও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। আক্রান্ত রাষ্ট্র ও মদতদাতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনাস্থা থেকে জন্ম নিচ্ছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরিতা ও সংঘর্ষ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানের তিক্ত সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের অশুভ পরিণতির একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ব্যাপারটি শুরু করেছে অবশ্য পুঁজিবাদী দেশগুলিই। তারা পুঁজিবাদী শোষণ ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলিয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, সন্ত্রাসমূলক কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে, স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনেতাদের হত্যা করিয়ে তার জায়গায় বশংবদ পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এইভাবে কঙ্গো, চিলি, নিকারাগুয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে ইন্ধন জুগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য মদতদাতা দেশগুলি নিজেরাও তাদের সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদের বলি হয়েছে।

আজকের দুনিয়া যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত, তার মধ্যে অন্যতম হল সন্ত্রাসবাদ। রাষ্ট্রীয় অথবা অ-রাষ্ট্রীয় উভয় প্রকার সন্ত্রাসবাদই মানুষকে ক্রমশই বেশি বেশি পরিমাণে অসহায় ও নিরাপত্তাহীন করে তুলছে। সন্ত্রাসবাদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্ল ডয়েটশ্চ (Karl Deutch) বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ কিছু পাল্টাতে পারে না বা কিছু সমাধানও করতে পারে না ("Terrorism usually changes little and solves

nothing ....")।' বাস্তবিকপক্ষে সন্ত্রাসবাদ না-পারে কোনো কিছুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে, না-পারে কোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে। সন্ত্রাসবাদ যা পারে তা হল মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতে।

• সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় [Means to Combat Terrorism] :

বর্তমান বিশ্বের ছোটো-বড়ো, উন্নত-অনুন্নত সমস্ত রাষ্ট্রই কমবেশি সন্ত্রাস কবলিত। বর্তমান দিনে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু সন্ত্রাসবাদ, তাই মানবসভ্যতাকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে সন্ত্রাসবাদের বিনাশ দরকার। কিন্তু কী করে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যাটি হল সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার অভাব এবং পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো রাষ্ট্র সন্ত্রাস-কবলিত হলে অন্য রাষ্ট্র সাধারণত নির্বিকার থাকে, অথবা দায়সারা মন্তব্য করে পাশ কাটিয়ে যায়। তবে আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ যেরূপ আন্তর্জাতিক আকার নিয়েছে, তাতে আজ আর কোনো রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে পারছে না। বিশ্বের সব ধরনের ও সব প্রান্তের রাষ্ট্রই আজ যৌথভাবে এই সাধারণ শত্রুটিকে মোকাবিলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলেই যে-কোনো সম্মেলনে বা বৈঠকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন এবং নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথ মোর্চা গঠন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মোর্চায় যোগ দিয়েছে অথবা সমর্থন করেছে। অপরদিকে রাশিয়া ও চিন এই উদ্দেশ্যে 'সাংহাই উদ্যোগ' নামক সন্ত্রাস-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেছে। এতে যোগ দিয়েছে মঙ্গোলিয়া-সহ সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান ইত্যাদি। নির্জোট সম্মেলনগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে উন্নয়ন-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক-ভুক্ত দেশগুলিও (ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ১৯৮৭ সালে যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ রোধে কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন :

(১) কায়রোর আরব লিগের সচিবালয়ে গৃহীত Arab Convention on Suppression of Terrorism;

(২) আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মেলনে (OAU) গৃহীত Convention on the Prevention and Combating of Terrorism.

(৩) মিনস্কে CIS-ভুক্ত প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির চুক্তি Treaty on Co-operation Among States Members of CIS;

(৪) ASEAN Regional Forum-এ ASEAN ও USA-র মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতা;

(৫) ইউরোপের স্ট্রাসবুর্গে European Convention of the Suppression of Terrorism;

(৬) আমেরিকা মহাদেশীয় আঞ্চলিক সংগঠন OAU-র Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism.[1]

সন্ত্রাসবাদ দমনে এইসব আঞ্চলিক উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্ত্রাসবাদীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আশপাশের এলাকায় আত্মগোপন করে। ভারতের বিচ্ছিন্নকামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নেয়। তাই সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে আঞ্চলিক স্তরে যৌথ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

• সন্ত্রাসবাদ দমনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ :

আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। তাই একে ঠিকমতো মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। গত শতকের ৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি; অবশ্য নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি, কারণ ওই সময় পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাছাড়া ওই সময় সন্ত্রাস সংগঠিত হত কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সন্ত্রাস ছিল কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, যাতে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ছিল সনদ-বিরোধী। ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হতে থাকলে পশ্চিম জার্মানি এই নতুন আন্তর্জাতিক বিপদ সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ তথা বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন থেকেই সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়।

বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে জাতিপুঞ্জের প্রথম পদক্ষেপটি হল **১৯৭২ সালে একটি বিশেষ কমিটি গঠন**। অবশ্য সন্ত্রাস-বিরোধী কাজকর্মের প্রকৃতি নিয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতবিরোধের ফলে এই কমিটি কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জাতিপুঞ্জের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সন্ত্রাসবাদের শিকার হলে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে এই কনভেনশনে অনুপুঙ্খ আলোচনা হয়।

এরপর ১৯৮৭ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ কনভেনশন আহ্বান করে। কোনো রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের শিকার হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে

সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই কনভেনশনে। এর প্রায় এক দশক পরে ১৯৯৯ সালে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যে কনভেনশনটি আহ্বান করা হয় তাতে সন্ত্রাসবাদকে কীভাবে সমূলে উৎপাটিত করা যায় সে নিয়ে আলোচনা হয়। এই কনভেনশনের লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের রসদ সংগ্রহ, অস্ত্র নিয়োগ, প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি কাজকর্ম বন্ধ করা। ১৯৯২ সালে তদানীন্তন মহাসচিব বুত্রোস ঘালি 'Agenda for Peace' নামক যে প্রতিবেদনটি সাধারণসভায় পেশ করেন তাতেও সন্ত্রাসবাদকে যে-কোনো মূল্যে প্রতিহত করার কথা বলা হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। সুতরাং এসবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সন্ত্রাসবাদ দমনে জাতিপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯৯৪ সালে সাধারণসভা কর্তৃক গৃহীত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, "সাধারণসভা যে-কোনো ধরনের সন্ত্রাসকে অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করে, তা সে যেই করুক বা যেখানেই করুক" ("The general Assembly unequivocally condemned all acts of terrorism, as criminal and unjustifiable wherever and by whom so ever committed ......")। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সদস্যরাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজটি বাধ্যতামূলক হিসাবে দেখবে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দ্রুত অপসারণে তৎপর হবে। এ ব্যাপারে আর যা যা করণীয় সেগুলি হল: (ক) সব ধরনের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে অর্থ সাহায্য, উৎসাহ ও প্ররোচনা দান থেকে বিরত থাকা; (খ) নিজ নিজ ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া; (গ) সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধীদের আটক, বিচার ও শাস্তিপ্রদান; (ঘ) সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে চুক্তি সম্পাদন; (ঙ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি; (চ) প্রচলিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করা; এবং (ছ) সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় আশ্রয় না দেওয়া। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিপুঞ্জের সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক (UN Millennium Summit)-এ সকল প্রকার সন্ত্রাসকে জরুরি ভিত্তিতে দমন ও বিনাশ করার উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় বিমান হানার প্রেক্ষিতে জাতিপুঞ্জের যে বিশেষ অধিবেশন বসে, সেখানেও সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজ পর্যন্ত অনেক উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব উদ্যোগ কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এখনও পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। অথচ এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় তখন আরও ব্যাপক আকারে মানবতার অবমাননা হয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার আসল সমস্যাটা হল আন্তরিকতার

অভাব। বস্তুত এ ব্যাপারে সব দেশ সমানভাবে তৎপর ও আন্তরিক হয় না। সুতরাং সন্ত্রাসবাদকে দমনে জাতিপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি তৎপর হতে হবে এবং বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে সন্ত্রাস প্রতিহত করার কাজে যুগপৎ পক্ষপাতহীন ও আন্তরিক হতে হবে।

প্রশ্ন ভারতের মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর: 1948 সালের 10 ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত পরিষদ এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করে। মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human rights) বিশ্বের সকল প্রান্তের সমস্ত মানুষের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অর্থনীতি, রাজনীতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমানাধিকার ঘোষণা করা হয়। এটিই মানবাধিকার নামে পরিচিত। একটি মানুষের বাঁচার জন্য এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সকল প্রকার স্বাধীনতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে

এবং এইসমস্ত বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি যাতে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান মেনে চলে তার জন্য সকলের কাছে আবেদন করা হয়। এই ঘোষণার অনেক পরে **1993 সালে ভারত সরকার মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করে** (Human Rights Acts 1993)। সহজ কথায়, মানবাধিকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্র সরকারের বা যে-কোনো গোষ্ঠীর বে-আইনি, অমানবিক অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার। মনে রাখতে হবে, অনেক জংগি গোষ্ঠী প্রতিদিন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, এমনকি গণহত্যাও করছে। ভারতের মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, **'মানবাধিকার হল' ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য, মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত।**

জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার ঘোষণার 30টি ধারায় নানাবিধ অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পৌর অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকারগুলি যুক্ত হয়েছে। এ সবই মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত।

ভারত তার মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি, প্রস্তাবনা প্রভৃতির মধ্যে ইতিমধ্যেই এই অধিকারগুলি যুক্ত করেছে। তাছাড়া, 1993 সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নও কার্যকরী করে। তথাপি ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ও কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতে তিন রকমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে; যথা—রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে, জঙ্গি ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠী দ্বারা এবং জাতপাত শ্রেণির দ্বারা। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে পুলিশ এবং মিলিটারির দ্বারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বহু উদাহরণ আছে। আলকায়দা, আইসিএস প্রভৃতি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন, খালিস্থানী, বোরো নাগা, আলফা, আজাদ কাশ্মীর প্রভৃতি গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিদিন শত শত নিরীহ নাগরিক এবং নিরাপত্তা রক্ষী নিহত হচ্ছে। তাছাড়া, মাওবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাঝেমধ্যে পুলিশ ও মিলিটারির মধ্যে গণহত্যা চালাচ্ছে। এছাড়া, ভারতের চিরকালীন জাতপাতের অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘৃণ্য চক্রান্ত।

এই সকলপ্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে **1970 সাল থেকে ভারতে মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়।**

◆ মানবাধিকার আন্দোলনের বিবরণ

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার পর থেকে সূচিত হলেও এই আন্দোলন মূলত সুসংগঠিত আকারে দেখা যায় 1969–70 সাল থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। নকশাল বাড়ি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পুলিশ ও মিলিটারি যথেচ্ছভাবে হত্যা করে। নকশালবাড়ি সমর্থকদের ওপর সরকার নৃশংস

নির্যাতন ও অত্যাচার চালায়। এর ফলে সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও অভিযোগ ওঠে। এই সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংগঠন গড়ে ওঠে যারা নকশালদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন বন্ধের দাবি তোলে। এইসব কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Civil Liberties Committee, Pudr Pucl, AFDR, APCLC প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের বহু কমিটি নকশাল সহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বন্দি মুক্তি কমিটি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি উল্লেখযোগ্য। এইসব সংগঠন মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ, সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ প্রভৃতির মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে।

ভারতে তিনটি সর্বভারতীয় মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন আছে, যারা সারা ভারতেই মানবাধিকার রক্ষার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। এই তিনটি সংগঠন হল কলকাতার APDR, দিল্লির Peoples Union For Democratic Rights এবং Peoples Union For Civil Liberties। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা Amnesty International সারা ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা শুধু ভারত সরকারকে সতর্ক করে শান্ত থাকে না, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন এবং অন্যান্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতে মানবাধিকার সংস্থাগুলি সর্বদাই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত বহু সফল আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কাশ্মীর, মণিপুর, দিল্লি, বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি রাজ্যের কথা বলা যায়। এইসব রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানবাধিকার আন্দোলন ক্রমশ গণআন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে। এইসব আন্দোলনের জন্যই বহু অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হয়। বহুক্ষেত্রে আন্দোলনের জেরে বন্দিমুক্তি এবং বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে সরকার বাধ্য হয়েছে।

ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা সরকার দায়ী নয়। **বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন একইভাবে নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশ ও মিলিটারিকে যেভাবে হত্যা করে তাও সমর্থনযোগ্য নয়।** এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংগঠনগুলিও সোচ্চার হয়েছে এবং জঙ্গি সংগঠনগুলিকে নির্বিচারে গণহত্যা কর্মসূচি থেকে সরে আসার জন্য নাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কয়েকটি জঙ্গি ও উগ্রপন্থী সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকে, যার মধ্যে আছে নকশাল বাড়ি সমর্থক মাওবাদী এবং জনগোষ্ঠী। তাছাড়া, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদী সংস্থা, যেমন—আলকায়দা,

ইসলামিক রাষ্ট্র, আজাদ কাশ্মীর প্রভৃতি। এইসব সংগঠনগুলি প্রতিনিয়ত কাশ্মীর সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

ভারতের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ আন্দোলনও যুক্ত। কারণ, অপ্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকা জড়িয়ে আছে। তাই এগুলিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ—চিপকো, নর্মদা বাঁচাও, Silent Valley প্রভৃতি পরিবেশ আন্দোলনের নাম করা যায়।